কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২২
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৩

সূরা ফুরকান (৬৩-৭৭)

কুরআনের ২৫ তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ৭৭টি এবং রুকু সংখ্যা ৬ টি। আল ফুরকান অর্থ সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী।

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াত تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ থেকে সূরা নাম গৃহীত হয়েছে । কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো এ নামটিও বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং আলামত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে । তবুও সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামটির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রয়েছে ।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার মনে হয়, এ সূরাটিও সূরা মু’মিনূন ইত্যাটি সূরাগুলোর সমসময়ে নাযিল হয় । অর্থাৎ সময়টি হচ্ছে, রসূলের (সা) মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময় । ইবনে জারীর ও ইমাম রাযী যাহহাক ইবনে মুযাহিম ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের একটি রেওয়ায়াত উদ্বৃত করেছেন । তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটি সূরা নিসার ৮ বছর আগে নাযিল হয় । এ হিসেবেও এর নাযিল হবার সময়টি হয় মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়।

সূরার বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

- কুরআন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত এবং তাঁর পেশকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের পক্ষে থেকে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হতো সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে । এর প্রত্যেকটি যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে সত্যের দাওয়াত থেকে মুখু ফিরিয়ে নেবার খারাপ পরিণামও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ।
- সূরা মু’মিনূনের মতো মু’মিনদের নৈতিক গুণাবলীর একটি নকশা তৈরি করে সেই মানদণ্ডে যাচাই করে খাঁটি ও ভেজাল নির্ণয় করার জন্য সাধারণ মানুষের সামনে রেখে দেয়া হয়েছে ।

প্রতিযোগিতার সিলেবাসের আলোকে আলোচ্য বিষয়

আল্লাহ তা’আলা সূরা ফুরকানের ৬৩-৭৪ আয়াত পর্যন্ত তার বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের ১২টি গুণের কথা বলেছেন। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস, সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহভীতি যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয় বস্ত শামিল আছে। মুমিনের গুণাবলি উল্লেখ করার পূর্বে - عِبَادُ الرَّحْمَنِ রাহমান এর বান্দারা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

وَ عِبَادُ الرَّحۡمٰنِ الَّذِیۡنَ یَمۡشُوۡنَ عَلَی الۡاَرۡضِ هَوۡنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الۡجٰهِلُوۡنَ قَالُوۡا سَلٰمًا ﴿۶۳﴾

৬৩. আর রাহমান-এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম;

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে- وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ রাহমান এর বান্দারা। আরবী 'ইবাদ' শব্দটি 'আবদ' এর বহুবচন। 'আবদ' শব্দটির মূল অর্থ গোলামী ও দাসত্ব করা। আর যে দসত্ব ও গোলামী করে সে হচ্ছে 'আবিদ'। 'আবদ' শব্দটিও এ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মানে আবদ হচ্ছে দাস ও গোলাম। আল্লাহ তাঁর অনুগতদের 'আবদ' বলে সম্বোধন করতে ভালবাসেন। কুরআন মজীদে যত জায়গায় 'আবদ' ও এর বহুবচন 'ইবাদ' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে সকল জায়গাতেই আল্লাহর ভালবাসার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাতটি জায়গায় 'আবদ' বলে সম্বোধন করেছেন। কোথায়ও বলেছেন 'আবদুহু- তাঁর বান্দা' কোথাও বলেছেন 'আবদানা- আমার বান্দা'। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই আবদ ও ইবাদ বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন, 'ইবাদী- আমার বান্দারা।' কোথাও তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন 'ইয়া ইবাদী' বলে- মানে 'হে আমার বান্দারা'। ইবাদুর রাহমান এসেছেঃ মাত্র ২টি স্থানে। একটি এই সূরা আল ফুরক্বানে, আর অপরটি সুরা আয যুখরুফে।

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, 'আবদ' ও 'ইবাদ' শব্দের ব্যবহার খুবই সম্মানজনক। এর ব্যবহার তাদের জন্যই করা হয় যারা আল্লাহর খুব প্রিয়। এখানে عباد الله আল্লাহর বান্দা না বলে عِبَادُ الرَّحْمَنِ রাহমান এর বান্দা বলার কারণ, সম্ভবত এটি যে, এর দুই আয়াত আগে আল্লাহ এরশাদ করেছেন :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْ لِلرَّحۡمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحۡمَٰنُ﴾ [الفرقان: ٥٩]

'যখন তাদেরকে বলা হলো রাহমান-এর উদ্দেশ্য সিজদা কর। তখন তারা বলল, রাহমান আবার কী?

কাফির- মুশরিকরা আল্লাহকে 'রাহমান' হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ এখানে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিলেন عِبَادُ الرَّحْمَنِ রাহমান এর বান্দা হিসেবে।

এখানে মুমিনদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার শুরুতে মুমিনদের পরিচয়ে বলা হয়েছে 'ইবাদুর রহমান- রাহমান-এর বান্দাগণ'। আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, (ইতোপূর্বের আয়াতগুলোতে) মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং কুরআন ও (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নবুওয়াতকে আক্রমণ বিষয়ের আলোচনার পর (আল্লাহ) তাঁর মুমিন বান্দা ও তাদের গুণাবলীর আলোচনা করেছেন এবং তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়ে তাদেরকে নিজের বান্দাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন, যেমনটি তিনি (তাঁর রাসূল সম্পর্কে) বলেছেন, 'পবিত্র ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন।' যে আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর দাসত্ব করে এবং কান, চোখ, জিহবা ও হৃদয়কে আল্লাহ যে বিষয়ে আদেশ করেছেন সে বিষয়ে ব্যস্ত রাখে, 'বান্দা' নামটির প্রয়োগ তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর যে এর বিপরীত সে আল্লাহর বাণী 'তারা চতুষ্পদ জন্তু। শুধু তাই নয়, বরং তার চেয়েও অধম' এর অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে কুরতবী)

বুঝা গেল সকল মানুষ এমনকি সকল মুমিন আল্লাহর বান্দা নয়। আল্লাহর বান্দা তারাই যারা কান, চোখ, মুখ ও অন্তর দিয়ে আল্লাহর বিধান মানে। যারা আল্লাহর যথাযথ আনুগত্য ও দাসত্ব করে। আর আল্লাহর বান্দা হওয়া সত্যিই সম্মানের ও বড় ভাগ্যের ব্যাপার।

আল্লাহর বান্দাহদের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো :
যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে- يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা না করা। বরং তাদের চালচলন। হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নাত বিরোধী। হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুত গতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ অর্থাৎ "চলার সময় পথ যেন তার জন্য সংকুচিত হত।" [ইবনে হিব্বানঃ ৬৩০৯] এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি অসুস্থ? সে বললঃ না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে , মানুষের চলার মধ্যে এমন কি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসংগে সর্বপ্রথম এর কথা বলা হয়েছে ? এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে , মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভংগীর নাম নয় বরং আসলে এটি হয় তার মন-মানস , চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির চলা , একজন গুণ্ডা ও বদমায়েশের চলা , একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা , একজন আত্মম্ভরী অহংকারীর চলা , একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা , একজন দরিদ্র-দীনহীনের চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেককে দেখে কোন ধরনের চলার পেছনে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে , রহমানের বান্দাদের তোমরা সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেই তারা কোন ধরনের লোক পূর্ব পরিচিত ছাড়াই আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করতে পারবে। এ বন্দেগী তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে তৈরী করে দিয়েছে তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। এক ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতে জানতে পারে , তারা ভদ্র , ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী , তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না।

অনুরুপভাবে কোরআনের অন্যত্রে এসেছে-

- পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভঙ্গিতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে। (সূরা লোকমানঃ ১৮)
- সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছেঃ "যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিওে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌছে যেতে পারবে।" (আয়াত-৩৭)
- "নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নিচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।" (সূরা লোকমানঃ ১৯)

আল্লাহর প্রিয় বান্দার পথচলায় কোন ধরনের দম্ভ ও অহংকার থাকবে না। অনুরূপ থাকবে না কোন ধরনের হীনমন্যতা, ভীরুতা ও জড়তা। বরং তার মধ্যে থাকবে বিনয়, শালীনতা আত্মমর্যাদা। এটি রহমান-এর বান্দাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো-

যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম

যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে- 'সালাম'। এখানে جَاهِلُون শব্দের অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। মুর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছেঃ "আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।" [সূরা আল-কাসাসঃ ৫৫]

যদি এ ধরনের কেউ গায়ে পড়ে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং তাকে কোন ধরনের মন্দ কথা বলে, সে তাকে অনুরূপ মন্দ বলবে না, বরং বলবে 'সালাম'। এ সালামের অর্থ কী?
তাফসীরে ফতহুল কাদীরে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- এই 'সালাম' অর্থ সালাম দেয়া নয় বরং এর অর্থ নিরাপদে এড়িয়ে যাওয়া। আরবরা বলে থাকে 'সালাম'- মানে আমি তোমার থেকে দূরে সরে পড়লাম।
ইমাম ইবনে কাসীর আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন- মূর্খ ও নির্বোধরা যদি আল্লাহর বান্দাদের সাথে মন্দ কথা বলে, আল্লাহর বান্দারা তাদের সাথে অনুরূপ মন্দ কথা বলে না। বরং ক্ষমা করে দেয় ও তাদের প্রতি উদারতা দেখায়। মন্দ কথার পরিবর্তে তারা বরং ভাল কথাই বলে। এরপর ইমাম ইবনে কাসীর ইমাম আহমাদের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক লোক আরেক লোককে গালি দিল। যাকে গালি দেয়া হলো সে গালি দেয়া লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তোমাদের দু'জনের মাঝে একজন ফেরেশতা অবস্থান করছিলেন। যখনি এ লোকটি তোমাকে গালি দিচ্ছিল ফেরেশতা তোমার পক্ষ হয়ে তাকে বলছিলেন বরং এ গালি তোমারই প্রাপ্য। আর যখন তুমি তাকে বললে, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক তখন তিনি (ফেরেশতা) বললেন, না বরং শান্তি তোমারই উপর বর্ষিত হোক। শান্তি তোমারই প্রাপ্য।'

আল্লাহর বান্দা মূর্খ ও নির্বোধ লোকদের সাথে নিজ থেকে তো কোন ধরনের বাক-বিতন্ডায় জড়াবে না, তার করণীয় হলো তাদেরকে এড়িয়ে চলা। আর এ এড়িয়ে চলা মোটেই দুর্বলতা প্রদর্শন নয়, বরং এর মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা পায় আর অনর্থক সময় নষ্ট হয় না। আল্লাহ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বান্দাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ হেদায়েতই দিয়েছিলেন : 'তারা (কাফেররা) যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল।' (১০ : মুযযাম্মিল)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যে হেদায়েত দিয়েছেন, তা তার অনুসারীদের জন্যও প্রযোজ্য। তাই যারাই আল্লাহর পথে চলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে চায়, তারা তাদের বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা, অপবাদ, নিন্দা, অশালীন কথা, বিদ্রূপ, সাজানো ভিত্তিহীন কথায় ধৈর্য ধারণ করবে ও তাদের এ ধরনের আক্রমণকে এড়িয়ে চলবে।

وَ الَّذِيۡنَ يَبِيۡتُوۡنَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ﴿۶۴﴾

৬৪. এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রব-এর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে;

এ আয়াতে রাহমান- এর বান্দাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো তারা সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। আরেকটি হলো তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চায়।

এ আয়াতে বক্তব্যের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত দিনের বেলায় মুমিন ব্যক্তির চাল-চলন, ব্যবহার ইত্যাদি দিনের জীবন কিভাবে হবে সেটা বলা হয়েছে। আর এই আয়াতে বলা হচ্ছে রাতের জীবন সম্পর্কে। তাদের রাত আরাম , আয়েশে , নাচগানে , খেলা-তামাশায় , গপ-সপে এবং আড্ডাবাজী ও চুরি-চামারিতে অতিবাহিত হয় না। জাহেলীয়াতের এসব পরিচিত বদ কাজগুলোর পরিবর্তে তারা এ সমাজে এমন সব সৎকর্ম সম্পাদনকারী যাদের রাত কেটে যায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে , বসে শুয়ে দোয়া ও ইবাদাত করার মধ্য দিয়ে। তাদের দিনের বেলা কাটে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে। বিনয়ের মাধ্যমে তারা রাতও কাটায় আল্লাহর অনুগত হয়ে। সিজদার মাধ্যমে। আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থেকে। সিজদা ও দাঁড়ানো বলতে নামায বুঝানো হয়েছে। সরাসরি নামায না বলে সিজদা ও দাঁড়ানো বলা হল কেন? এ প্রসঙ্গে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ. বলেন : সালাত (নামায)- এর পরিবর্তে সিজদা ও দাঁড়ানো বলা হয়েছে। রাতের গভীরে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন রাহমান- এর বান্দাদের নড়াচড়াকে চিত্রায়িত করার জন্য। এরা এমন লোক যারা তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। তাদের লক্ষ্য একমাত্র তাদের রব। শুধু তাঁর উদ্দেশ্যেই তারা দাঁড়ায়। শুধু তার জন্যই তারা সিজদাবনত হয়। তারা এমন লোক যারা সুখের নিদ্রা বাদ দিয়ে তারচেয়েও বেশি সুখ ও মজার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত।

তারা তাদের প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়াতে ব্যস্ত। তারা তাদের আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হতে ব্যস্ত। মানুষ ঘুমায় অথচ তারা দন্ডায়মান ও সিজদাবনত। মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান করছে অথচ তাদের দৃষ্টি মহিমান্বিত করুণাময়ের আরশের দিকে। (ফী যিলালিল কুরআন, খ: ৫, পৃ: ২৫৭৮)

বান্দা নানামুখী কর্মব্যস্ততার মধ্যদিয়ে দিনের সময় কাটাবে। রাতের নিস্তব্ধতায় তার মহান প্রভুর সামনে একাগ্রচিত্তে দাঁড়াবে। তাঁর সামনে মাথা নত করবে। তাঁকে সিজদা করবে। এটি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের জীবনের এ দিকগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন

- সূরা সাজদায় বলা হয়েছে : তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, নিজেদের রবকে ডাকতে থাকে আশায় ও আশংকায়।" (১৬ আয়াত)

- সূরা যারিয়াতে বলা হয়েছে- এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দোয়া করতো।" (১৭-১৮ আয়াত)
- সূরা যুমারে বলা হয়েছে : "যে ব্যক্তি হয় আল্লাহর হুকুম পালনকারী , রাতের বেলা সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে তার পরিণাম কি মুশরিকের মতো হতে পারে ?" (৯ আয়াত)

রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে নামায পড়া, গুনাহ থেকে ইস্তিগফার করা (ক্ষমা চাওয়া), কান্নাকাটি করা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন :

- 'রাতের কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাক। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত। তোমার রব-প্রভু তোমাকে উত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন।' (৯৭ : বনী ইসরাঈল)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত রাত্রে জাগতেন ও নামায আদায় করতেন। এ প্রসঙ্গে আয়শা রা. বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় নামাযে (এত দীর্ঘ সময়) দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার পা দু'টো যেন ফেটে যেত। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমনটি করছেন কেন? অথচ আপনার পূর্ব ও পরের সব গুনাহ মাফ হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, 'আমি কি (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ বান্দাহ হব না?' (বুখারী ও মুসলিম)

রাতের নামাযের ফজীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

- আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা আল্লাহর মাস মহররমে রোযা ও ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাতের নামায।' (মুসলিম)
- আবদুল্লাহ ইবন সালাম থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়। (এগুলো করে) তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর।' (তিরমিযী)
- আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ করুণা করুন ঐ ব্যক্তির উপর, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়। স্ত্রী যদি উঠতে না চায় তাহলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ করুণা করুন ঐ নারীর প্রতি, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে দেয়। স্বামী যদি উঠেতে না চায় তাহলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।' (আবু দাউদ)
- ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন একজন লোকের আলোচনা করা হল যে, ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত ঘুমায়। তিনি বললেন, 'এ লোকটি তো এমন লোক, শয়তান যার কানে প্রস্রাব করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটায় না। তারা ঘুমায় ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যায়। নামায পড়ে। বিনয়ী হয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। রাতে যে কোন সময় নামায পড়া যায়। তবে সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাতের শেষ তৃতীয় প্রহর। এ অংশটি খুবই মর্যাদার। রাতের এ অংশ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'রাতে এমন একটি সময় আছে যে সময়টিতে কোন মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তাকে সেটি প্রদান করেন।' (মুসলিম)

আর এ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ সময়টি হচ্ছে শেষ তৃতীয় প্রহর-

হযতর আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্নিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমাদের মহান প্রভু প্রতিরাতে নিচের আকাশে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে। তিনি বলেন, কে আছ আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাও, আমি তাকে (যা চায় তাই) দেব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তাকে ক্ষমা করব।' (বুখারী)

যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চায়, সে এমন মর্যাদাপূর্ণ সময়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রভু যখন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করে তার বান্দাদের ডেকে ডেকে তাঁর কাছে চাইতে বলে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলে আর তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেবেন, যা চায় তাই দেবেন, ক্ষমা করে দেবেন, তখন তাঁর কোন বান্দা কি ঘুমিয়ে থাকতে পারে?

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ٭ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۵﴾

৬৫. এবং তারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে নিন, তার শাস্তি তো অবিচ্ছিন্ন।

রাহমান- এর বান্দারা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ সময়ে উঠবে। তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে। সেজদাবনত হবে। তাঁকে ডাকবে। তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন। তাঁর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের সকল ধরনের কল্যাণ চাইবে, তিনি তাদেরকে তা দেবেন। সকল ধরণের গুনাহ, ভুল-ত্রুটি থেকে ক্ষমা চাইবে। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। রাহমান- এর বান্দা হঠাৎ করে কোন এক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নয় বরং প্রতিরাতেই জাগবে। কেননা তার প্রভু তো প্রতিরাতেই নিচের আকাশে অবতরণ করেন আর ডাকেন কে আছো আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। কে আছো আমার কাছে চাও, আমি দেব। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করে দেব।
রাহমান- এর বান্দারা রাতে উঠে তাদের প্রভুর সামনে দাঁড়ায়। তাঁকে সিজদা করে। শুধু তাই নয়, তারা বলে, 'হে আমাদের রব- পালনকর্তা। আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিকে সরিয়ে দাও।'

আল্লাহর সত্যিকার বান্দা কখনো নিজের নেক আমলের উপর নির্ভর করে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ মনে করে না। তার বিশ্বাস সে যতই নেক আমল করুন, এ নেক আমলের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী ছাড়া জাহান্নাম থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই সে আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়েও জাহান্নামের কঠিন শাস্তিকে ভয় পায়। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চায়। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে।
আলোচ্য আয়াতে বলেছে,
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ
'হে আমাদের প্রভু! জাহান্নামের আযাবকে আমাদের থেকে সরিয়ে দাও।'
এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে 'জাহান্নামের আযাবকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দাও।' মানে আমাদেরকে এভাবে চলার যোগ্যতা দাও যেন আমাদের অবস্থান পর্যন্ত জাহান্নাম এগিয়ে আসতে না পারে। জাহান্নাম যেন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে। আমরা যেন জাহান্নাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারি।

রহমানের বান্দা ওরাই যারা একদিকে রাত্রে আল্লাহর ইবাদত করে, আবার অন্য দিকে ভয়ও করে যে, কোন ভুল বা আলস্যের কারণে আল্লাহ ধরে না বসেন। সেই জন্য তারা জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত তথা আজ্ঞা পালন করা সত্ত্বেও আল্লাহর আযাব ও তাঁর পাকড়াও হতে নির্ভয় হওয়া ও নিজ ইবাদতের উপর গর্ব করা উচিত নয়। এই অর্থ অন্য জায়গায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। (সূরা মু'মিনূন ৬০ আয়াত) ভয় শুধু এই কারণে নয় যে, তাদেরকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে; বরং তাদের ভয় হয় যে, তাদের দান খয়রাত গ্রহণ হচ্ছে কি না? হাদীসে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'এই আয়াতে কি ঐ সব লোকেদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মদ পান ও চুরি করে?' তিনি বললেন, ''না, হে আবূ বাকরের বেটী! বরং তারা ঐ সব লোক, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে, দান করে। তা সত্ত্বেও তারা ভয় করে যে, তাদের এইসব সৎকর্মগুলো যেন আল্লাহর দরবারে অগ্রহণীয় না হয়ে যায়।'' (তিরমিযী, কিতাবুততাফসীর সূরাতুল মু'মিনূন)

রাহমান- এর বান্দাগণ, নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকে। তার পরও তাদের মনে ভয় ও শঙ্কা থেকেই যায়। তাই তারা রাতের শেষ প্রহরে উঠে প্রভুর উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, সিজদা করে আর জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মহান দরবারে আকুতি জানায়। সে স্বচক্ষে জাহান্নাম দেখেনি। তবে সে কুরআন মজীদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতে জাহান্নামের চিত্র দেখেছে। জাহান্নামের যে ভয়াবহ চিত্র তার সামনে ফুটে উঠেছে তাতে তার এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, জাহান্নামের শাস্তি নিরবচ্ছিন্ন। জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট আবাস।

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬. নিশ্চয় সেটা বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে খুব নিকৃষ্ট।

অর্থাৎ এ ইবাদাত তাদের মধ্যে কোন অহংকারের জন্ম দেয় না। আমরা তো আল্লাহর প্রিয়, কাজেই আগুন আমাদের কেমন করে স্পর্শ করতে পারে, এ ধরনের আত্মগর্বও তাদের মনে সৃষ্টি হয় না। বরং নিজেদের সমস্ত সৎকাজ ও ইবাদাত-বন্দেগী সত্ত্বেও তারা এ ভয়ে কাঁপতে থাকে যে, তাদের কাজের ভুল-ত্রুটিগুলো বুঝি তাদের আযাবের সম্মুখীন করলো। নিজেদের তাকওয়ার জোরে জান্নাত জয় করে নেবার অহংকার তারা করে না। বরং নিজেদের মানবিক দুর্বলতাগুলো মনে করে এবং এজন্যও নিজেদের কার্যাবলীর উপর নয় বরং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপর থাকে তাদের ভরসা।

وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।

এ প্রসংগে অমিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য কি জিনিস তা জানা উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অমিতব্যয়িতা বলা হয়। এক , অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করা , তা একটি পয়সা হলেও । দুই , বৈধ কাজে ব্যয় করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে সে নিজের সামর্থের চাইতে বেশী ব্যয় করে অথবা নিজের প্রয়োজনের তুলনায়

অনেক বেশী যে অর্থসম্পদ সে লাভ করেছে তা নিজেরই বিলাসব্যসনে ও বাহ্যিক আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে পারে। তিন , সৎকাজে ব্যয় করা। কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং অন্য মানুষকে দেখাবার জন্য। পক্ষান্তরে কার্পণ্য বলে বিবেচিত হয় দু'টি জিনিস । এক , মানুষ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় করে না। দুই , ভালে ও সৎকাজে তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। এ দু'টি প্রান্তিকতার মাঝে ইসলামই হচ্ছে ভারসাম্যের পথ।

وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿۶۸﴾

৬৮. এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আর আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

আরবরা তিনটি গুনাহের সাথে খুব বেশী জড়িত ছিল। রাহমানের বান্দাদেরকে গুণ হলো, ঐ তিনটি গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে। গুনাহ তিনটি হলোঃ ১. শিরক। ২. অন্যায় ভাবে হত্যা। ৩. যিনা।

একটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে আর বাকী দু'টির সম্পর্ক মানুষের সাথে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত গুনাহটি হচ্ছে শির্ক। শির্ককে কুরআন মজীদে 'জুলমে আজীম' বলা হয়েছে। লোকমান আ. নিজ ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন। 'হে আমার স্নেহের ছেলে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। কেননা শির্ক জুলমে আজীম'। (১৩ : লোকমান)

'জুলমে আজীম' অর্থ হলো বড় ধরনের অবিচার। কুরআন মজীদ আর কোন অন্যায় ও অপরাধকে 'জুলমে আজীম' হিসেবে অভিহিত করেনি। পুরো কুরআনে এ একটি অপরাধকেই 'জুলমে আজীম'- বড় ধরনের অবিচার বলা হয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে বলেছৈন সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার কারণ হচ্ছে শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘিত হয়। 'শির্ক' না করা বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার।

পূর্ববর্তী ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গোনাহ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। [ফাতহুল কাদীর]

এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "একজন মুমিন ঐ পর্যন্ত পরিত্রাণের আশা করতে পারে যতক্ষণ সে কোন হারামকৃত রক্ত প্রবাহিত না করে'। [বুখারী: ৬৮৬২]

রহমানের বান্দারা কোন ব্যভিচার করে না। ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয় না। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সবচেয়ে বড় গুণাহ কি? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি কাউকে (প্রভুত্ব, নাম-গুণে এবং ইবাদতে) আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাও"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি তোমার

সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে অংশ নেবে"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি তোমার পড়াশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর"। [বুখারীঃ ৬৮৬১, মুসলিমঃ ৮৬]

يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَ يَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৬৯. কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বর্ধিতভাবে প্রদান করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়;

এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ শাস্তির ধারা খতম হবে না বরং একের পর এক জারী থাকবে। দুই , যে ব্যক্তি কুফরী , শির্ক বা নাস্তিক্যবাদের সাথে হত্যা ও অন্যান্য গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে যাবে সে বিদ্রোহের শাস্তি আলাদাভাবে ভোগ করবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে আলাদা আলাদাভাবে । তার ছোট বড় প্রত্যেকটি অপরাধ শুমার করা হবে। কোন একটি ভুলও ক্ষমা করা হবে না। হত্যার জন্য একটি শাস্তি দেয়া হবে না বরং হত্যার প্রত্যেকটি কর্মের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে। যিনার শাস্তিও একবার হবে না বরং যতবারই সে এ অপরাধটি করবে প্রত্যেকবারের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি পাবে। তার অন্যান্য অপরাধ ও গোনাহের শাস্তিও এ রকমই হবে।

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٍۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

৭০. তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তাদের গুণাহসমূহ নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

রহমান- এর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বিষয়ের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, তারা যে শুধু ভাল কাজ করে তাই নয়, তারা আল্লাহর নাফরমানী থেকেও বিরত থাকে। এ পর্যায়ে তিনটি বড় বড় নাফরমানীর উল্লেখ করা হয়েছে। শির্ক, হত্যা ও যেনা- ব্যভিচার নাফরমানীগুলোর পরই বলা হয়েছে যারা এসব নাফরমানী ও অপরাধ করবে তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। শাস্তির পরিমাণ যে ভয়াবহ হবে শুধু তাই নয়। এ শাস্তি হবে অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর। এ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে তারাই যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে। কিয়ামতের কঠিন ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তিনটি জিনিস প্রয়োজন তাওবা, খাঁটি ঈমান ও নেক আমল। এর কোন একটি নয়, দুটিও নয়। তিনটিই প্রয়োজন। শুধু তাওবা নয়, তাওবার সাথে থাকতে হবে কাঁটি ঈমান আর তার সাথে থাকতে হবে আমলে সালেহ- নেক আমল। আর যাদের মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'আর তারাই (এমন লোক) যাদের অপরাধগুলোকে আল্লাহ পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।'

এই যে পাপ ও অপরাধকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করা হবে এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন-
তাদের অপরাধগুলোকে আল্লাহ পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন এর অর্থে দু ধরনের বক্তব্য রয়েছে। একটি হলো তারা নেক কাজের মাধ্যমে অন্যায় কাজের পরিবর্তন করেছে (মানে আগে তারা যেখানে অন্রায় কাজ করত এখন সেখানে তারা ভাল কাজ করছে)। আয়াতের অর্থে আলী ইবন আবি তালহা আব্দুল্লাহ ইবন আববাস থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, এরা ঐসব মুমিন যারা তাদের ঈমানের আগে অন্রায় ও অপরাধমূলক কাজ

করত। আল্লাহ তাদেরকে অন্যায় ও অপরাধ থেকে ফিরিয়ে নেক ও কল্যাণের দিকে এনে দিয়েছেন। এভাবে তিনি তাদেরকে মন্দ ও অন্যায় থেকে নেক ও কল্যাণে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।
আর দ্বিতীয়টি হলো, খাঁটি তাওবার কারণে তাদের অতীত অপরাধগুলো নেক ও কল্যাণে পরিবর্তিত হচ্ছে আর তা এভাবে যে, যখনি সে তার অতীতকে স্মরণ করে সে অনুতপ্ত হয়, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ও ক্ষমা চায়, আর এভাবে তার গুনাহ পূণ্যে পরিবর্তিত হয়।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে :
'আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালূ'। কুরআন মজীদে (غَفُوْرًا) 'ক্ষমাশীল' শব্দটি মোট একানব্বই বার এসেছে। অধিকাংশ স্থানে শব্দটির পর (رَحِيمًا) 'দয়ালু' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।
ক্ষমা ও দয়া শব্দ দুটির মধ্যে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ক্ষমা সেই করতে পারে যার মধ্যে দয়া আছে। যার মধ্যে দয়া নেই, সে ক্ষমা করতে পারে না। কুরআন মজীদে বার বার বলা হয়েছে 'আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, বান্দাহকে আল্লাহ ক্ষমা করেন, কারণ তিনি যে পরম দয়ালু।

وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾
৭১. আর যে তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, ' যে তাওবা করে ও নেক আমল করে সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।' যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, শুধু তাওবা নয় নেক আমলও করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। তাওবা ও নেক আমল দু'টিকে একত্রে উল্লেখ করে সম্ভবত এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বান্দার জন্য যা শোভনীয় নয়, যা অন্যায়, অপরাধ ও পাপ তা সে ছেড়ে দেবে, তার জন্য সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। আর যা তার করা উচিত যা তার জন্য কল্যাণকর, যার পরিণাম ও পরিণতি শুভ সে তা করবে। গুনাহ ও অপরাধ করলেই যে তাওবা করতে হয় তা নয় বরং সব সময়ই আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হয়। তাওবা নিজেই একটি ইবাদত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে পরের সব গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তারপরও তিনি তাওবা করতেন।

আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর কসম! আমি দিনে সত্তর বারের অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তার কাছে তাওবা করি।'(বুখারি)
বান্দাহ গুনাহ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে- এটি আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ না করতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সরিয়ে নিতেন। অতঃপর অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।' (মুসলিম)
আল্লাহ ক্ষমাসীল। বান্দাহ যদি গুনাহই না করল তাহলে তার এগুণ ও বৈশিষ্ট্যের কার্যকারিতা থাকত না। তাই তো তিনি চান বান্দাহ ও গুনাহ করবে আর তার কাছে ক্ষমাও চাইবে। তিনি বান্দাহকে ক্ষমা করবেন। এভাবেই তাঁর ক্ষমাশীলতার প্রকাশ ঘটবে। বান্দাহর অপরাধ ও গুনাহর পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন তাওবা করলে তিনি বান্দাহকে ক্ষমা করবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন, আনাস রা. থেকে বর্ণিত। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান ! তোমার পাপের পরিমাণ

যদি আকাশচুম্বীও হয় আর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। এ ব্যাপারে আমি পরোয়াই করব না।' (তিরমিযী)

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল তাওবা ও ইসতেগফার করলে আল্লাহ খুশি হন। তাই আল্লাহ নেক বান্দাগণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা তাওবা ও ইস্তেগফার করেন।

وَ الَّذِیۡنَ لَا یَشۡهَدُوۡنَ الزُّوۡرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوۡا بِاللَّغۡوِ مَرُّوۡا کِرَامًا ﴿۷۲﴾

৭২. আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে আপন মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।

আয়াতে উল্লিখিত (لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) এর দুটি অর্থ। একটি হলো 'তারা সাক্ষ্য দেয় না' আরেকটি হলো 'তারা উপস্থিত থাকে না।' (الزُّورَ)শব্দটিরও একাধিক অর্থ রয়েছে। মিথ্যা, অন্যায়, মিথ্যা সাক্ষী, শির্ক, নাচ-গানের অনুষ্ঠান ইত্যাদি। তাহলে (لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) এর একাধিক অর্থ হতে পারে। আল্লাহর নেক বান্দাগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, কারণ এতে অন্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব হয়। অপরদিকে অন্যায়কে সাহায্য করা হয়। অন্যায় ও মিথ্যার চর্চা হয় এমন কোন স্থানে তারা কখনো উপস্থিত হয় না। শির্ক হয় এমন কোন অনুষ্ঠানে তারা উপস্থিত থাকে না। তারা গান- বাজনা ও নাচের অনুষ্ঠানে যায় না।

আব্দুল্লাহ ইবন আববাস (الزُّورَ) এর অর্থ করেছেন – 'যূর' হচ্ছে মুশরিকদের ধর্মীয় উৎসবাদি। (কুরতবী খঃ ১৩ পৃঃ৭৯) তাঁর এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহর নেক বান্দাগণ অমুসলিমদের ধর্মীয়-অনুষ্ঠানাদিতে যায়না। তারা যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না, অনৈতিক কোন কাজ করে না ও অশোভনীয় কোন আচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় না শুধু তাই নয়, যদি কখনো এসবের কাছ দিয়ে যেতে হয় তাহলে তারা খুবই সতর্কতার সাথে এসব এড়িয়ে চলে।

আয়াত আরেক অংশ- .وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

'যখন তারা অর্থহীন কোন কাজের পাশ দিয়ে যায় তখন সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে তা অতিক্রম করে।' (لغو) শব্দটির অর্থ অর্থহীন কথা বা কাজ। এমন কথা ও কাজ যার কোন ধরনের গুরুত্ব নেই। মুমিন কোন ধরনের অর্থহীন কথা বলতে পারে না, অর্থহীন কাজ করতে পারে না। এটি সফল মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-'মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী আর যারা অর্থহীন কথা ও কাজ থেকে বিরত।' (১-৩ : সূরা মুমিনুন)

মুমিন নিজকে কখনো অনর্থক ও গুরুত্বহীন কোন বিষয়ে জড়ায়না। মুমিন তো তার সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করবে। সময় নামক মূল্যবান পূঁজির সর্বোত্তম বিনিয়োগ করবে। এমন কথা ও কাজে সময় খরচ করবে যা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে দুনিয়া ও আখিরাতে। সে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে তার সময়কে কাজে লাগাবে।

রহমান- এর বান্দাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো :

وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا ﴿۷۳﴾

৭৩. এবং যারা তাদের রব-এর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে তার উপর অন্ধ এবং বধিরের মত পড়ে থাকে না।

মুমিনদের অবস্থা এমন হতে পারে না যে, তাদেরকে আল্লাহর আয়াত স্মরণ করানো হবে। আর তাদের মধ্যে তা কোন প্রভাব ফেলবে না। মুমিন যখন আল্লাহর মহান কিতাব- কুরআন পড়বে তখন সে তা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়বে। কুরআন বুঝবে, বুঝার চেস্টা করবে, কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে গবেষণা করবে। কুরআন পড়বে অথচ কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে না, কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে না, এতো মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি তো এমন লোকদের বৈশিষ্ট্য যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। 'এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন করেছেন। তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ? (২৩-২৪ মুহাম্মদ)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, কুরআন নিয়ে গবেষণা না করা আল্লাহর অভিসম্পাতপ্রাপ্ত অন্ধ-বধিরদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর মহান কিতাব- কুরআনের আয়াত একদিকে আল্লাহর নেক বান্দাহদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে যাদের অন্তরে রয়েছে অবিশ্বাস ও কপটতা তাদের মনের অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- 'তারাই তো মুমিন যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ কয়য়ে দেয়া হলে তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে।' (২ : সূরা আনফাল)

'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের (অন্তরের) কলুষতার সাথে আরো কলুষতা বৃদ্ধি করছে।' (১২৫ : সূরা তাওবা)

সূরা ফুরকানের শেষাংশে উল্লিখিত রাহমান- করুণাময় আল্লাহর বান্দাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দোয়া করে।

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

৭৪. এবং যারা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য চোখজুড়ানো। আর আপনি আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

আল্লাহর বান্দগণ নিজেরাই শুধু উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী হবে তা নয়, তারা চায় তাদের সন্তানরাও যেন এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন করে। তারা চায় তাদের স্ত্রীগণ যেন তাদের মত উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তাহলে মন আনন্দে ভরে যাবে। আর এ আনন্দে যে মানসিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। আনন্দে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

আল্লাহর নেক বান্দাগণের আকাঙ্খা তাদের সন্তান ও স্ত্রীগণ যেন আল্লাহকে যারা ভয় করে চলে তাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হয়। তারা তাদের আকাঙ্খা পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায়। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আল্লাহ যেন তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের এমন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী বানিয়ে দেয় যাতে তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। আল্লাহ যেন তাদেরকে মুত্তাকীদের ঈমাম (নেতা) বানিয়ে দেয়।

স্ত্রী- সন্তানদের উত্তম গুণাবলীর অধিকারী করে চোখের শীতলতারূপে বানানো ও তাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ বানানোর জন্য দোয়া করাকেও আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ স্ত্রী- সন্তানরা হচ্ছে একজন লোকের সবচেয়ে কাছের মানুষ। এদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী জবাবদিহী করতে হবে। স্ত্রী ও সন্তান যদি আল্লাহর অনুগত হয়ে চলে তাহলে একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় প্রশান্তি আর কিছু নেই। আর যদি তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় তাহলে এর চেয়ে বড় বেদনার কিছু নেই।

আয়াতে চোখের শীতলতা বলতে রূপ, সৌন্দর্য, পার্থিব মেধা, যোগ্যতা ও সফলতাকে বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাদের ঔরশ থেকে এমন সন্তান সৃষ্টি করেন, যে তাঁর আনুগত্য করবে ও শুধু-মাত্র তারই ইবাদত করবে। তার কোন শরীক নেই।

এ আয়াত সম্পর্কে হাসান বসরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন.আল্লাহর শপথ, সন্তান, সন্তানের সন্তান, ভাই অথবা বন্ধুকে আল্লাহর অনুগত দেখবে মুসলমানের চোখকে ঠান্ডা ও শীতল করার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন বিষয় নেই। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

কুরআন ও হাদীসে সন্তানকে আমল-মানে ‘কর্ম’ হিসেবে চিহ্নত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা নূহ (আঃ) কে তার এক সন্তান সম্পর্কে বলেন, ‘হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে অসৎ কর্ম।’ (৪৬ : হূদ)

অপরদিকে হাদীসে নেক সন্তান সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘‘আদম সন্তান (মানুষ) যখন মারা যায় তখন তার সকল আমল (কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি কর্ম অব্যাহত থাকে। আর সেগুলো হল নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে, এমন জ্ঞান- যা দিয়ে তার পরের লোকজন উপকৃত হয়, আর সদকায়ে জারিয়া।’ (মুসলিম)

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হলে শুধু নিজে ভাল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেই চলবে না, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ভালগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে।

রাহমান- করুণাময়ের বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর তাদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এভাবে-

---

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا ﴿٧٥﴾

৭৫. তারাই, যাদেরকে প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আর তারা প্রাপ্ত হবে সেখানে অভিবাদন ও সালাম।

‘তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে (জান্নাতের) কক্ষ তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে। তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম।’

বলা হয়েছে ‘তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে (জান্নাতের) কক্ষ।’ যাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে তারা কারা? তারা রাহমান- পরম করুণাময় আল্লাহর বান্দা। যারা পূর্বের আয়াতসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও গুণবলীর অধিকারী। তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, ‘তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার প্রতিদানে।’ এর থেকে বুঝা গেল রাহমান- এর বান্দাহদের যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে এসব গুণাবলী অর্জন সম্ভব নয়, নফস- প্রবৃত্তির লাগামহীন কামনা- বাসনাকে দমন করে কঠোর সাধনার মাধ্যমে এ গুণাবলী অর্জন করতে হবে। দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও প্রবৃত্তির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব।

আল্লাহর নেক বান্দাহদের জান্নাতে সালাম ও শুভেচ্ছার মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তাদেরকে এ অভ্যর্থনা জানাবে জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন :

'যারা তাদের রব (প্রভুকে) ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের কাছে পৌঁছবে- আর জান্নাতের দরজাগুলো আগ থেকেই খোলা থাকবে- তখন জান্নাতের রক্ষীগণ বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, তোমরা স্থায়ীভাবে থাকার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।' (৭৩: সূরা যুমার)

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿۷۶﴾

৭৬. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট!

রাহমান- এর বান্দাহদের স্থায়ী আবাস হবে জান্নাত- জান্নাতের পরিচয়ে বলা হয়েছে 'বসবাস ও আবসস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম।' ঠিক এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে জাহান্নাম সম্পর্কে।' যে জাহান্নাম থেকে রাহমান- এর বান্দারা বাঁচতে চায়। 'বসবাস ও আবসস্থল হিসেবে এটি কতই না নিকৃষ্ট।'

নিকৃষ্ট আবাস- জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য রাহমান- এর বান্দাগণ তাঁর দরবারে আকুতি জানায়, শুধু আকুতিই নয় এর থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করে। আর এভাবেই তারা উত্তম আবাস- জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের সর্বোত্তম পুরস্কার ও প্রতিদান ঘোষণার পর বলেন,

---

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّیْ لَوْ لَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿۷۷﴾

৭৭. বলুন, আমার রব তোমাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না, যদি না তোমরা তাকে ডাক। অতঃপর তোমরা মিথ্যারোপ করেছ, সুতরাং অচিরেই অপরিহার্য হবে শাস্তি।

যদি তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করো , তাঁর ইবাদাত না করো এবং নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য তাঁকে সাহায্যের জন্য না ডাকো , তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের কোন গুরুত্বই নেই। এ কারণে তিনি নগণ্য তৃণখণ্ডের সমানও তোমাদের পরোয়া করবেন না। নিছক সৃষ্টি হবার দিক দিয়ে তোমাদের ও পাথরের মধ্যে কোন ফারাক নেই। আল্লাহর কোন প্রয়োজন পূরণ করতে হলে তোমাদের উপর নির্ভর করতে হয় না। তোমরা বন্দেগী না করলে তাঁর কোন কাজ ব্যাহত হবে না। তোমাদের তাঁর সামনে হাত পাতা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করাই তাঁর দৃষ্টিকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। এ কাজ না করলে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে ময়লা আবর্জনার মতো।

তাফসীর সমাপ্ত

প্রস্তুতি সহায়ক এই নোট তৈরী করতে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাই-বোনের দারস/নোট, ইন্টারনেট থেকে তথ্য ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

ফুটনোট

সূরায়ে ফোরকানের শেষাংশে রাহমান এর বান্দাদের যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো হলো :

১. বিনয় (**জমিনে সম্রতাসহকারে চলাফেরা করা**) ২. ধৈর্য্য ও সহনশীলতা(**যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তাদেরকে সালাম বলা,)** ৩. তাহাজ্জুদ আদায় ৪. জাহান্নামের ভয় ও তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ৫. অপব্যয় ও কৃপণতা না করা ৬. শিরকমুক্ত থাকা ৭. যেনা ব্যভিচার ও হত্যার সাথে জড়িত না হওয়া ৮. তাওবা করা ৯. মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা ও অর্থহীন কাজকে এড়িয়ে চলা, ১০. কুরআনের আয়াত অনুধাবন করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। ১১. স্ত্রী ও সন্তান যেন আল্লাহর অনুগত হয় এ জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

*** ইসলামে ব্যয় করার নীতি হলো- অপচয় না করা আবার কার্পণ্য**
*** যে তাওবা করার সাথে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঈমান থাকা এবং সৎকাজ করা অর্থাৎ পূনরায় পাপে না জড়ানো তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তাওবা কবুল করবেন এবং পাপকে সওয়াবে পরিণত করে দিবেন।**

* স্ত্রী-সন্তাদের জন্য দোয়াটি হচ্ছে-
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
রাব্বানা- হাবলানা- মিন আযওয়াঝিনা- ওয়া জুররিইয়্যা-তিনা- কুররাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াঝআ'লনা- লিলমুত্তাক্বিনা ইমা-মা।
এই দোয়াটি আমরা বেশী বেশী করে পড়বো।
* আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদের এই সূরায় ইবাদুর রহমান বলে সম্বোধন করেছেন।
* কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রাতের নামাজের গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা যারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হতে চাই রাতের শেষাংশে মহান রাব্বুল আলামীনের সিজাদাহে অবনত হওয়া। নিজের মনের সব আকুতি জানানো, ইস্তিগফার করা, আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা আদায় করা। **রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ডেকে বলেন, কে আছ আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাও, আমি তাকে (যা চায় তাই) দেব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তাকে ক্ষমা করব।' (বুখারী) যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চায়, সে এমন মর্যাদাপূর্ণ সময়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রভু যখন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করে তার বান্দাদের ডেকে ডেকে তাঁর কাছে চাইতে বলে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলে আর তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেবেন, যা চায় তাই দেবেন, ক্ষমা করে দেবেন, তখন তাঁর কোন বান্দা কি ঘুমিয়ে থাকতে পারে?**
*** এই সূরার ৭৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে- 'এবং যারা তাদের রব-এর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে তার উপর অন্ধ এবং বধিরের মত পড়ে থাকে ন'**
আমাদের এই প্রতিযোগিতার এই কুরআন বুঝারই এই অংশ। আমরা যেন কুরআন বুঝতে পারি এবং আমলে নিয়ে আসতে পারি।
আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় বান্দা ইবাদুর রহমান হিসাবে কবুল করেন এবং যেগুনাবলী এখানে উল্লেখ আছে সেগুলো অর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন।।